ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1033-1039
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.101

‘অষ্টম গর্ভ’: পৌরাণিক উপমায় অলংকৃত সমাজ বাস্তবতার কাহিনি

সৌরভ মুখার্জি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই.বি.এন ইউনিভার্সিটি রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*

Received: 13.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ashtam Garbh: A Tale of Social Reality Adorned with Mythological Metaphors."Bani Basu's Ashtam Garbh is a unique novel where reality and imagination blend seamlessly, exploring the physical and psychological suffering of women, the crisis of self-identity, the struggles of motherhood, and social oppression in a profound manner.At the heart of the narrative lies the mystical beliefs and rituals of the Shibprasad and Durgaprasad families, creating a bridge between reality and mythology. The birth of three children in this setting is not just a familial event but symbolizes a deep philosophical exploration of life, destiny, and existence.Set against the backdrop of war, partition, and the breakdown of family structures, the novel unfolds through the perspective of children, portraying the complexities, conflicts, and struggles of human life. As their innocent minds confront reality, they gradually come to understand violence, betrayal, and the fight for survival.Bani Basu's distinctive literary style and philosophical approach turn this novel into a profound psychological and existential inquiry, compelling readers to reflect on the fundamental question – "What is the true meaning of human existence?"

***Key Word**: Aashtam Garbh, Poonorjonmo, Maatritiya, Jeevan Chakra, Deshbhaag*

বাণী বসু বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য লেখক, যিনি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশেলে এক নতুন সাহিত্যিক ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচনায় সমাজের বাস্তব চিত্র ও রূপকথার প্রতীকী ভাষার সংমিশ্রণ একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। ‘অষ্টম গর্ভ’ শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, এটি নারীর জীবনের গভীরতম অনুভূতি, মনের টানাপোড়েন এবং সৃষ্টির শক্তির প্রতীক। উপন্যাসটি নারীর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক বাধা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে নির্মিত। বাণী বসুর লেখনীতে বাস্তব ও রূপকথার মিশ্রণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম, সম্পর্কের জটিলতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে রূপকথার বিভিন্ন প্রতীক, যেমন পুনর্জন্ম, মাতৃত্ব, এবং জীবনের চক্র একটি গভীর দার্শনিক মাত্রা যোগ করেছে। ‘অষ্টম গর্ভ’ নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের প্রতীক। শিরোনামে ব্যবহৃত ‘অষ্টম গর্ভ’ প্রতীকী। এটি মাতৃত্বের ক্ষমতা এবং সৃষ্টিশীলতাকে চিহ্নিত করে। এই উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলোর স্বাধীনতা ও প্রথাগত সমাজের চাপের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। নারী কেবল সমাজের ভূমিকা পালনকারী নয়, বরং একজন ব্যক্তি হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাণী বসুর লেখনী সহজ এবং গভীর। তিনি চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা বোঝাতে সরাসরি সংলাপের পাশাপাশি বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুভূতির গভীরতা তুলে ধরেন। রূপকথার প্রতীকী ভাষা পাঠককে গভীরভাবে ভাবায়। ‘অষ্টম গর্ভ’ শুধুমাত্র নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, এটি সমগ্র মানবসমাজের একটি দর্পণ। বাণী বসু নারীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি

বৃহত্তর সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভ' বাস্তবতা ও রূপকথার মেলবন্ধনের মাধ্যমে নারীর জীবনের গভীরতর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছে। এটি কেবল সাহিত্যিক মানের দিক থেকে নয়, বরং সমাজের গভীর সমস্যাগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অসাধারণ।

এই উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, নারীর জীবনের বাস্তবতা ও কল্পনার এই অনন্য মিশ্রণ পাঠককে নতুন করে ভাবতে শেখায়। শিরোনামের অধীনে বাণী বসুর বিভিন্ন উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং তাতে বাস্তবতা ও রূপকথার সংমিশ্রণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তার লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব সমস্যা ও রূপকথার প্রতীকী উপস্থাপন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নীচে উল্লেখিত উপন্যাসগুলো এই আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক:

অষ্টম গর্ভ উপন্যাসের শুরু বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখে শিবপ্রসাদ মনে করেন, কলিযুগের শেষ সময় আসন্ন। শিবপ্রসাদ পেশায় একজন বিজ্ঞানসাধক, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক এবং দক্ষ সার্জন হলেও অলৌকিকতায় তাঁর গভীর আস্থা। যুদ্ধকালীন সংকটের সময়, যখন মানুষ দল বেঁধে কলকাতা ছাড়ছে, তখন শিবপ্রসাদের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ পরিবার নিয়ে বীরভূমের সুরুল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা, এবং এটি তাঁর অষ্টম গর্ভ।

দুর্গাপ্রসাদ পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। ব্যবহারিক জীবনে তিনি শিবপ্রসাদের আদর্শের বিরোধিতা করলেও অলৌকিক বিশ্বাসে বাবার মতোই দৃঢ়। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কলিযুগের শেষ সময়ে তাঁদের পরিবারেই এক অবতার আবির্ভূত হবেন। তাঁদের পূর্বপুরুষের নামের কারণে এই পরিবার 'হরিবংশ' নামে পরিচিত। অবশেষে ভাদ্র মাসের একদিন, প্রবল বৃষ্টির রাতে, তাঁদের বিশ্বাস যেন সত্যি হলো। শিবপ্রসাদ নির্দেশ দিলেন যে প্রসব যন্ত্রণা যতই তীব্র হোক, কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া যাবে না। অলৌকিক ঘটনাই বলা যায়, দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রীর অষ্টম গর্ভে তিনটি সন্তান জন্ম নিল – দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।

> "চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধেয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে, আসন টলেছে। শঙ্খ- চক্র-গদা-পদ্মধারী তিনি আসছেন, নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার দরজা ওই ঝনঝন শব্দে খুলে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাকে ঘর্মসিক্ত করে আমি সড়াক করে অবতীর্ণ হলুম। কারিয়াপিরেত বা। রোমশ, কুৎসিত, লোলচর্ম বাঁদর-বাচ্চা এক।"[১]

'ধাত্রী বললেন- মেয়ে হয়েচে গো ডাক্তারবাবু। বাপরে, কী কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে গো! সে সময়ে ধাত্রীরা একটু স্পষ্টবক্তাই হতেন'।[২]

'পিসিমা শাঁখ নিয়ে রেডি ছিলেন। থতমত খেয়ে গেলেন। পণ্ডিত কালিকামোহন একবার গোঁত্তা খেয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। বহু শ্রাদ্ধবাড়িতে তুমুল হট্টগোল, মন্ত্রোচ্চারণ ও কীর্তনের মধ্য দিয়েও একমনে গীতা পাঠ, উপনিষদ পাঠ তাঁর অভ্যেস আছে। ঠিক আড়াই মিনিটের মাথায় আবার আমি হড়কে এলুম। ধাত্রী বললেন, 'যমক গো কর্তা, এবার ব্যাটাছেলে এয়েচে। কী সোন্দর।' এবার আমি ফর্সা টুকটুকে হয়েছি, ঠিক আমার মায়ের মতো। দুরন্ত দমে শাঁখ বাজতে লাগল'।[৩]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অষ্টম গর্ভ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস। নাহি জাণ এবে তোঁ আপণার নাশ।।
> যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অষ্টম। অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।। [১।৪]
> 'তাহাক আষ্টম গর্ব্ভজাণী দৈবকীর। আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ।। [৭]
> সুপুরুষ গর্ব্ভধরল আনুরূপ। দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ।। [৮]
> ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাস' ।। [৯।৫]

সমাজের একটি অদ্ভুত নিয়ম যেখানে মেয়েরা যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অষ্টম গর্ভ মানে তার আগে সাতটি সন্তান আছে। আর অষ্টম গর্ভ তিনটি সন্তান হয়েছে। তাই মায়ের জন্য বলছেন –

> "বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়! জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভূজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এই অকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।"[৬]

এটি একটি চমৎকার সাহিত্যিক উদ্ধৃতি, যা সাধারণত মানুষের যন্ত্রণা, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা এবং মাতৃত্বের বিষয়ে গভীর অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। এখানে, লেখক মাতৃত্বের কষ্ট এবং এক ধরনের আত্মপ্রকাশের অনুভূতি তুলে ধরেছেন, যেখানে এক নতুন জীবন পৃথিবীতে আসছে এবং মা একদিকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত হলেও তার অভিজ্ঞতা ও জীবনধারা সম্পর্কে কিছু কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এই গল্পে এমন এক মর্মান্তিক বাস্তবতা এবং গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা রয়েছে যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

উপন্যাসের সূচনাতেই স্বয়ং কৃষ্ণের একটি গভীর কথোপকথন ফুটে ওঠে, যেখানে তিনি পরম শক্তির আধার সুদর্শন চক্র নিয়ে আলোচনা করেন—যে চক্র এক সময় অসুর বিনাশের অন্যতম অস্ত্র ছিল। কিন্তু এই চক্রের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—এটি শত্রুর বিনাশ না করে কখনো ফিরে আসত না। তাহলে আজ? যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, লোভী কূটনীতিবিদদের আনাগোনা কমেনি; বরং তারা আরও শক্তিশালী, আরও সাংঘাতিক রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এই বিপুল অনাচারের ভার কি আজ একা কোনো মানব-কৃষ্ণের পক্ষে বইতে সম্ভব? হয়তো সেই কারণেই যুগান্তর ধরে সুদর্শন চক্র আর ফিরে আসেনি। কিন্তু চক্র কি হারিয়ে গেছে? নাকি পৃথিবীর অসংখ্য অসুরের মাঝে তার ধ্বংসাত্মক শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, ঠিক নিউক্লিয়ার বোমার বিভক্ত উগ্রতার মতো? এখানে কৃষ্ণ শুধুই দ্বাপর যুগের এক পুরাণপুরুষ নন, তিনি বিরাট পুরুষ—ঋগ্বেদের সেই অনাদি শক্তি, যাঁর অস্তিত্ব কালের সীমা অতিক্রম করে বর্তমানেও প্রতিধ্বনিত হয়।এমন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একটাই প্রশ্ন ওঠে আজকের সমাজ কি এতটাই কলুষিত যে, কৃষ্ণের প্রেরিত সুদর্শন চক্রও হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে? তাই লেখিকা বলছেন–

> 'এত দুঃশাসন কোথা হইতে আসিল? এত শকুনি'![৭]

বাণী বসুর এই অংশটি মূলত মানবজীবনের জটিলতা, সম্পর্কের গভীরতা এবং অস্তিত্বের দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে লেখা। শৈশবের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সম্পর্ক, এবং পৌরাণিক উপমাগুলো একত্রে মিলে এটি একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক টুকরো হয়ে উঠেছে। এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমষ্টিগত দার্শনিক প্রশ্নগুলোকে যুক্ত করে, যা বাণী বসুর রচনার অনন্য বৈশিষ্ট্য। লেখক অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ একই সঙ্গে সৃষ্টির (গিরি গোবর্ধন) এবং ধ্বংসের (প্লাবন) শক্তি ধারণ করে। তার মধ্যে এই দ্বন্দ্বই হয়তো তাঁর জীবনের গতি ঠিক করবে।এই লেখার শুরুতেই শৈশবের স্মৃতিগুলো উঠে এসেছে, যা একধরনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব এবং অস্তিত্বের সংকটকে বোঝায়। শিশুর দুধপানের অভিজ্ঞতা থেকে কঠিন খাবারে অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলো জীবনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে তুলে ধরে।

এক পৌরাণিক প্রসঙ্গে লেখিকা বলছেন –

> "অর্জুন যেন শুয়ে আছে শরশয্যায়, পিতামহ তার পিপাসা মেটাচ্ছেন। অর্জুন আর ভূমিকা শুধু উল্টে গেছে।"[৮]

'আসলে আমার অভিভাবকরা জানেনই না আমি যম না যমুনা। গিরি গোবর্ধন ধারণ করব, না প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো। তাঁদের অনন্ত আশা মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন লড়াই করে যে বেঁচেছে তার ভবিষ্যৎও অনন্ত'।[৯]

যম না যমুনা: অর্থাৎ, মৃত্যু এবং সৃষ্টির মধ্যে টানাপোড়েন।গিরি গোবর্ধন ধারণ করা না প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়া: অর্থাৎ, দায়িত্ব পালন করা না ধ্বংস করে দেওয়া—জীবনের এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

"এই ব্রজ এই গোষ্ঠ এই বৃন্দাবন
এই চুমা এহি কোরে হে নন্দ নন্দন
এই খেলা এই ধুলা গোকুল ব্যাপিয়া
ভুলিও না বাপা কভু দিও না ভুলায়্যা।"[১০]

এই অংশটি একটি কবিতার অতি সূক্ষ্ম এবং আবেগময় বিবরণ, যা বিশেষভাবে মায়ের স্নেহ, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং মধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। এটি হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মা, যশোদার প্রতি একটি বিশেষ অর্ঘ্য।

একটি প্রৌঢ় গলার মধ্যে তরুণীর আকুলতা তুলে ধরছেন, যা জীবনাচরণের বিভিন্ন দিকের সমান্তরালে চলে। এই অনুভূতি মায়ের দুধের গন্ধ, সন্তানদের প্রতি স্নেহের গভীরতা, এবং তাদের শৈশবকালীন মুহূর্তগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। যখন 'যশোমতী' নামে মা যশোদার কথা বলা হয়, তখন এটি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সাথে এক অভূতপূর্ব সংযোগ স্থাপন করে। এই অংশটি বিভিন্ন অনুভূতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়— মায়ের স্নেহ, সন্তানদের জন্য অনুভূত গভীর ভালোবাসা, এবং চিরকালীন সম্পর্কের স্মৃতি। এছাড়াও, এখানে গোপাল ও ব্রজের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত, যেমন গোকুল, বৃন্দাবন, যশোমতী মায়ের অঞ্চল, এবং নন্দ নন্দন উল্লেখ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে।

> "আকাশে হালকা মেঘের মতো ভেসে থাকে একে দুই, দুয়ে এক, দুই-কোরে-দুই- কাঁদে-বিচ্ছেদ-ভাবিয়া চিরবিরহী অস্তিত্ব এক। পাশাপাশি হাসাহাসি, তবু বুক হু হু, তবু ভুবন ধু-ধু। বারোমেসে বিচ্ছেদ-কোকিল সেই ভুবন জুড়ে ডাকতে থাকে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

> "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমি-বা কোথায় আর তুমিই-বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য; তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।"[১২]

'এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন 'দু'ই-কোলে দু'হু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।
চণ্ডীদাস লেখেন -'দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।[১৩]

এই অংশটি বাণী বসুর উপন্যাসের একটি গভীর, আত্ম-অন্বেষী এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে। এখানে একটি মেলানো অনুভূতি ও দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে 'থাকা-না-থাকার হিসেব', 'কান্না-হাসির, বিচ্ছেদ-ভাবিয়া, চিরবিরহী অস্তিত্ব' ইত্যাদি শব্দগুলি মানুষের মনোজগতের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, একাকীত্ব এবং আত্মবিশ্লেষণকে তুলে ধরে। 'কান্না-হাসির, মা-দিদিমার বখরা বাঁটাবাঁটি', এই অংশটি সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং পরিবারে থাকা নানা রকম অনুভূতির দোলাচলকে ইঙ্গিত করছে। 'ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত-ব্যোম বাষ্পীভূত হতে থাকে' অংশে, এটি প্রকৃতির উপাদানসমূহের সাথে মিলিয়ে মানব জীবনের এক পরিসীমা, যা চিরস্থায়ীভাবে পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত।

এই বর্ণনা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যময়তাকে প্রতিফলিত করে—একদিকে বিচ্ছেদ এবং একাকীত্বের দুঃখ, অন্যদিকে সম্পর্কের মধ্যে হাসির মিশ্রণ এবং পৃথিবীজুড়ে চলমান জীবনের বাচন। 'বিচ্ছেদ-কোকিল' শব্দটি জীবনের নিষ্ক্রিয়তা এবং পরিত্যাগের অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যখন 'বুক হু হু' ও 'ভুবন ধু-ধু'

শব্দগুলি অন্তরের গভীর ক্ষোভ এবং প্রহসনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। মোটকথা, এই অংশটি বাণী বসুর উপন্যাসে মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, জীবনের বিরহ ও সম্পর্কের সূক্ষ্ম দোলাচলগুলোর একটি শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরে।

> "তোমরা কেউ খোকাকে দেখচো না। কী যে সুন্দর দেয়ালা করে। আপন খেয়ালে থাকে। ওই কেল্টি মেয়েটির দিকে তোমাদের সবার মন।''কা-লো, জগতের আ-লো।' ঠাকুর্দা বলে লোকটা বলে। বাবা বলে লোকটা আমায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লুফে নেয়। আবার ছোঁড়ে আবার লোফে। প্রথমটা আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই, তারপর খেলাটা বুঝতে পারি। বুকের ভেতরটা একটু গুরগুর করতেই থাকে বটে, কিন্তু কাঁদি না। বাবা বলে- 'কী জানো তো সেজ মা, মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তার ওপর তোমার মতো কেল্টি, কেড়েকুড়ে না নিলে তো পাবে না, তাই এমন নেই-আঁকুড়ে। তোমার মতো 'হলেও হল, না হলেও হল' ফিলসফি তো আর সবার জন্যে নয়!"[১৪]

লেখাটি বাণী বসুর সাহিত্যধারার একটি নিখুঁত উদাহরণ।এটি গ্রামীণ/শহরতলির পাড়ার মানুষের জীবন, সম্পর্কের প্রকৃতি এবং শিশুদের কল্পনার দুনিয়াকে উপস্থাপন করে। লেখক মানুষের বহুরূপী স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন—যে চরিত্র একদিকে ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে মানবিক এবং স্নেহময়। শিশুমন এবং প্রাপ্তবয়স্কের জগৎ, কল্পনা ও বাস্তবতার এই মিশ্রণ লেখার প্রধান শক্তি।

> "পিসিমা-ঠাকুমার এই মতের মিল ও সাময়িক সখিত্বের সম্ভাবনায় বাজখাঁই ভিখারিণী পাড়ায় ঢুকলেইআমরা পুলকিত হয়ে উঠতুম।"[১৫]
>
> "এরাই আমাদের ধেনুকাসুর, শকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর.... কোনও না কোনওভাবে হয় ছদ্মবেশ ভেদ করে, নয় মজা পেয়ে, নয় রোমাঞ্চিত হয়ে, অর্থাৎ ভয় না পেয়ে আমরা এদের জয় করেছিলুম। তবে ভয় যে একেবারে কাউকেই পেতুম না তা নয়। পেতুম একজনকে। সে হল হীরেমোতি।"[১৬]

শিল্প ও স্বাধীনতা: শিল্পীর কাজ কখনো চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, বা যে কোনো শিল্প স্বাধীনতাই সঠিক রূপ পায়।

পুনর্জন্ম ও শাশ্বততা: মিত্রাবসুর মতো প্রতিভার পুনর্জন্মের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, প্রকৃত প্রতিভা কোনো পরিস্থিতিতেই নিঃশেষ হয় না।

ভাষা ও কল্পনা: ভাষা নিয়ে লেখকের কৌতুক এবং কল্পনা দেখায়, সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং শিল্পেরও অংশ।

'এখন পুরন্দর ইন্দ্র রাজার তো কোনও অভ্যেসটাই ভালো না! বর সেজে পরের বউয়ের কাছে যান। পিতৃহত্যা করেন, নিরপরাধ ত্রিশিরা মুনিকে কিছুতেই তপস্যাচ্যুত করতে না পেরে তাঁকে বজ্রাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন, সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি করে কপিলমুনির আশ্রমে নুকিয়ে রেখে আসেন ফলে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে (প্রজার) কপিল মুনিকে চোর ঠাওরায় এবং তাঁর অভিশাপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। লম্পট, পিতৃঘাতক, নিরপরাধ-হন্তা, চোর এই দেবতাটি সভায় বসে উর্বশীর মতো মহানাচিয়েকে লাস্যনৃত্য করতে বলেন, যখন হয়তো উর্বশীর তাণ্ডব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, বিশ্বাবসুকে মলহার গাইতে বলেন, যখন হয়তো তাঁর সাহানা গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর মিত্রাবসুর তো কথা-ই নেই। তাই মিত্রাবসু অন্যমনা হয়ে তাল ভঙ্গ করলেন। দাদাভাই বিশ্বাবসুর মাথা নিচু, উর্বশীর চোখে জল, ইন্দ্রের হাজার চোখে হাজার আগুন।-'যাও, নারী হয়ে পৃথিবীতে সঙ্গীত সাধনা করো গে যাও।' ব্যাস, মিত্রাবসু ডিগবাজি খেতে খেতে নামছেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মা দু হাত মেলে, কোল পেতে রয়েছেন, দেবহূতি-মায়ের কপালেই শিকে ছিড়ল। মিত্রাবসু বুজবুজদিদি হয়ে জন্ম নিলেন।'[১৭]

লেখিকা যুক্ত করেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর-

> "ওর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র - গান্ধারী কুন্তি বিদুর এদের সঙ্গ এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব, অতুল ঐশ্বর্য ভাইয়েদের আনুগত্য,সহযোগিতা প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পাননি।"[১৮]

বাণী বসুর সৃষ্ট জটিল এবং দার্শনিক কথোপকথনের একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে চরিত্রদের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তন, পৌরাণিক কাহিনির রূপক ব্যাখ্যা, এবং 'অবতার' ধারণার প্রশ্নাতীত মূল্যায়ন করা হয়েছে। বরুণ এবং দাদাভাইয়ের কথোপকথনে লেখকের দার্শনিক ও বুদ্ধিদীপ্ত মনন প্রকাশ ঘটে।

> "পরশুরাম সব রাজাদের মেরে শেষ করেছিলেন? বাঃ। এটা কি ভাল কাজ নাকি? উনিই তো বাবার কথায় মাকে মেরে ফেলেছিলেন। উনিই তো কর্ণকে রথ বসে যাবার শাপ দিলেন শুধু শুধু।-রাজারা হয়তো অত্যাচারী হয়ে গিয়েছিলেন। -আর কর্ণ? কর্ণ ওঁর ঘুম যাতে না ভাঙে তাই বজ্রকীটের দংশন সহ্য করলেন আর উনি শাপ দিলেন। রামও তো সীতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। ধ্বংস করা আর শাপ দেওয়া ছাড়া এঁরা কি কিছু জানেন না?"[১৯]

১. নৈতিকতার দ্বিধা: অবতাররা যা করেছেন, তা কি সময়ের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য ছিল, নাকি মানবতার জন্য আদর্শ নয়?

2. অন্তর্নিহিত ঈশ্বর: লেখক বোঝাতে চান, ঈশ্বর বাইরে নয়, বরং মানুষের ভেতরেই বিরাজমান।

3. বিবর্তন ও সভ্যতা: অবতারদের গল্প আসলে মানবজাতির বিবর্তনের এক প্রতীকী রূপ, যা প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

বাণী বসুর লেখনীতে বাস্তুভিটাহারা মানুষের যন্ত্রণা এবং তাদের সংকটপূর্ণ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি রাজনৈতিক বিভাজন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আলোকপাত করেছেন। বাণী বসু এই লেখায় ব্যক্তিগত যন্ত্রণার সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বুনে দিয়েছেন। তিনি কেবল দেশভাগের ভয়াবহতা দেখাননি, বরং শিশুদের সরল চোখ দিয়ে তা অনুভব করিয়েছেন। এই অংশটি পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে:

1. দেশভাগের মানবিক মাশুল।

2. রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সার্থকতা।

3. বিচ্ছিন্ন মানুষের পুনর্বাসন ও তাদের ভবিষ্যৎ।

গোটা উপন্যাসটি তৃতীয় সন্তানের জবানিতে লেখা। সে শারীরিকভাবে দুর্বল ও জন্মরুগ্ন হওয়ায় তার লালন-পালন দিদিমার তত্ত্বাবধানে হয়। এই তিন সন্তানের শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছানোর সময়কালই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগ, মন্বন্তর, লিগের শাসন, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান, দাঙ্গা, দেশভাগ- এসব ঘটনাবলী শিশুদের চোখ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তারা বড়দের আলোচনার ভিত্তিতে এসব ঘটনা নিজেদের রূপকথার জগতের সঙ্গে মিলিয়ে এক কল্পরাজ্য গড়ে তোলে। আবার লেখিকা লেখেন –

> "তিন জোড়া অপটু হাত বুঝি এই পৃথিবী এই সভ্যতার উপকরণগুলোর বিন্যাস অদলবদল করে দিয়েই গড়ে ফেলতে চাইছে এক চতুর্থ পৃথিবী।"[২০]

উপন্যাসটি তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত, এবং প্রথম পর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অনুসারে। এটি পাঠকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাণী বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এটি একটি।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯
২.ঐ, পৃষ্ঠা ৯
৩.ঐ, পৃষ্ঠা ৯
৪. চন্ডীদাসবড়ু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্ম খন্ড
৫. চন্ডীদাসবড়ু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্মখন্ড
৬. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ২৫
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩০
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৬
১৩. চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী,
১৪. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩৯
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৮
১৬. ঐ,পৃষ্ঠা ৮৮
১৭. ঐ,পৃষ্ঠা ৯৪
১৮. ঐ,পৃষ্ঠা ১৬২
১৯. ঐ,পৃষ্ঠা ২৯৭
২০. ঐ,পৃষ্ঠা ৩১৮